–ভালোই তো কাজের জিনিস।

–আরে বাবা, কাজ করা গেলে তো।

–কেন?

–ধ্যাৎ, এটা তো সতেরো বছর আগে কেনা।

–সতেরো বছর আগে! বলিস কি?

–হ্যাঁ,এই তো, দেখো না, বিল আছে তো...

–দেখি দেখি দেখি। ওর বাবা বিল হাতে নিয়ে চমকে উঠলেন। বললেন, এটা কে দিয়েছে?

মেয়ে বলল, সেটাই তো বোঝা যাচ্ছে না!

রিয়া বললেন, কেন? তুমি কি তাকে গিয়ে ধরবে নাকি?

–না না আসলে...

–আসলে কী? মেয়ে জিজ্ঞেস করতে বিলটা মেয়ের দিকে এগিয়ে গিয়ে ওর বাবা বললেন, বিলটা কার নামে, সেটা ভালো করে দ্যাখ।

মেয়ে হাতে নিয়ে বলল, ওমা, এখানে তো তোমার নাম দেখছি। তার মানে যারা দিয়েছে, তারা কি সতেরো বছর আগে তোমাদের কোনও বিবাহবার্ষিকীতে এটাই দেবে বলে কিনেছিল। কিন্তু তখন কোনও কারণে আর দিতে পারেনি বলে এই সতেরো বছর পরে তোমাদেরই দিল। শুধু তোমাদের নামে কিনেছিল বলে। ওর বাবা বলল, না না, তা না। এটা আমিই কিনেছিলাম।
রিয়া সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় ঘুরিয়ে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি কিনেছিলে মানে

মেয়ে হাতে নিয়ে বলল, ওমা, এখানে তো তোমার নাম দেখছি। তার মানে যারা দিয়েছে, তারা কি সতেরো বছর আগে তোমাদের কোনও বিবাহবার্ষিকীতে এটাই দেবে বলে কিনেছিল। কিন্তু তখন কোনও কারণে আর দিতে পারেনি বলে এই সতেরো বছর পরে তোমাদেরই দিল। শুধু তোমাদের নামে কিনেছিল বলে।

ওর বাবা বলল, না না, তা না। এটা আমিই কিনেছিলাম।

রিয়া সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় ঘুরিয়ে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি কিনেছিলে মানে?

ও, তার মানে তুমি এমন কোনও মহিলাকে নিমন্ত্রণ করেছিলে, লোকজনের সামনে আমাদের বিবাহবার্ষিকীতে খালি হাতে আসার অসম্মানের হাত থেকে বাঁচানো জন্য তুমি নিজেই তাকে এটা কিনে দিয়েছিলে? কে সে? অরুণিমা? বিপাশা? না অস্মিতা?

উনি বললেন, কী সব যা তা কথা বলছ?

–ও, তুমি যা তা কাজ করতে পারবে, আর আমি বলতে গেলেই দোষ?

–আরে সে সব নয়...

–তা হলে? ও আচ্ছা, দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও। সতেরো বছর আগে। সতেরো বছর। তা হলে কি মেয়ের মুখভাতে দেওয়ার জন্য আমাদের নাম করে কেউ এটা কিনেছিল?

–না না, আমার মনে হয়, কেউ বোধহয় সতেরো বছর আগে, সে বিয়েই হোক কিংবা মুখেভাত অথবা বিশেষ কারও জন্মদিন, আমাদের হয়তো নিমন্ত্রণ করেছিল। আমরা এই ইন্ডাকশনটা তাদের উপহার দিয়েছিলাম। আমার মনে হয়, কোনও কারণে তারা হয়তো প্যাকেটটাই খোলেনি!

মেয়ে বলল, এমনও হতে পারে, এটা তো কারেন্ট ছাড়া চলে না, যাদের দিয়েছিলে তাদের বাড়িতে হয়তো কারেন্টই নেই।

–স্টকারেন্ট নেই এরকম বাড়ি আবার আছে নাকি? ওর মা বলতেই মেয়েটি বলল, হয়তো সতেরো বছর আগে ছিল না!

–সে যাই হোক, এটা যে আমি কিনেছিলাম সেটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। কারণ, বিলটার নীচের বাঁদিকে আমার সই আছে।

–নতোমার সই? তোমার সই লেগেছিল কেন?

উনি বললেন, তখন এই ধরনের কোনও কিছু কিনলে, যিনি বিক্রি করছেন, তাঁকে বিলের ডানদিকে আর যিনি কিনছেন, তাঁকে বিলের বাঁদিকে সই করতে হত। বিশেষ করে গ্যারান্টি পিরিয়ডের জন্য। জিনিসটা কবে তৈরি হয়েছে, কবে গোডাউন থেকে দোকানে এসেছে, সেটা হিসেব করা হত না। যেদিন বিক্রি হত, সেদিন থেকেই গ্যারান্টি পিরিয়ড শুরু হত। ফলে যিনি বিক্রি করছেন এবং যিনি কিনছেন, তাঁদের দু'জনকেই সই করতে হত। বলতে পারিস, ওটা ছিল একটা ছোটোখাটো চুক্তিই।

–সে কী! মেয়ের মুখ থেকে অস্ফুট বেরিয়ে এল।

বাবা বললেন, যাদের দিয়েছিলাম, তারা পুরো প্যাকেটটাই ইনট্যাক্ট রেখে দিয়েছিল। এত বছর পরে তারাই আমার দেওয়া সেই উপহারটাই আমাকে ফিরিয়ে দিল।

মেয়ে বলল, তার মানে, তোমরা যাদের দিয়েছিলে, তাদের নেমন্তন্ন করতে হয় বলে করেছিলে, আসলে তাদের সঙ্গে তোমাদের কোনও সদ্ভাব নেই।

রিয়া বলল, হতে পারে।

স্বামী বললেন, সে রকম কে আছে? কে আছে? কে আছে?

মেয়ে বলল, আবার এমনও হতে পারে, তুমি যাদের দিয়েছিলে, তারা সেটা অন্য কারও বিবাহ বা অন্নপ্রাশনে দিয়ে দিয়েছিল। যাদের দিয়েছিল, তারা আবার অন্য কাউকে দিয়েছিল। এইভাবে উপহার হিসেবে এ হাত ও হাত সে হাত ঘুরতে ঘুরতে আবার তোমাদের হাতে এসে পড়েছে। হতেই পারে।

বাবা বললেন, তুই যে কী বলিস না। কোনও মাথামুণ্ডু নেই। যাই হোক, যে দিয়েছে তাকে তো খুঁজে পাওয়া যাবে না।

–একেবারেই যে পাওয়া যাবে না, সে কথা বলা যাবে না। ওইদিন তো ভিডিয়ো করা হয়েছিল। সেই ভিডিয়োর ফুটেজ চেক করলেই হয়তো পাওয়া যেতে পারে, কে দিয়েছে।

–পেলেও কী লাভ? পেলে তো আর বলা যাবে না যে, আপনি আমাদের ম্যারেজ অ্যানিভার্সারিতে এটা কী দিয়ে গিয়েছেন? নিয়ে যান। পারলে এর পরিবর্তে অন্য কিছু দিয়ে যান। আমরা এটা নেব না। না পারলে আপনাকে কিছুই দিতে হবে না। তবু এটা নিয়ে যান।

মেয়ে বলল, বাবা তুমি না ... কোনও দিনও পাল্টাবে না...

রিয়া বললেন, সত্যি... তুমি যে কী বলো না! এ সব আবার বলা যায় নাকি?

উনি তখন মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, তাহলে এটা কি করবি?

অন্য আর একটা উপহারের মোড়ক খুলতে খুলতে রিয়া বললেন, যেভাবে প্যাকেট করা ছিল, ঠিক সেভাবেই আবার প্যাকেট করে রাখব।

স্বামী বললেন, কেন?

–কেন আবার? সামনে অমরেশদার বিবাহবার্ষিকী আছে না? সেখানে দিয়ে দেব। দরকার হলে নতুন সেলোফেন পেপার এনে আরও সুন্দর করে একেবারে দোকানের মতো প্যাকেট করে দেব।

মেয়ে বলল, তা দাও, তবে ভুল করেও কিন্তু ওই প্যাকেটের মধ্যে আবার বিলটা ভরে দিও না...

রিয়া বললেন, না না, বিল তো দেবই না। কোনও ট্যাগও লাগাব না। একদম না।

বউয়ের কথা শুনে একটুক্ষণ চুপ করে থেকে স্বামী শুধু বিস্ময়ের সুরে বললেন, আবার?

অঙ্কন ঃঅভি

অণুগল্প

পিকনিক

শুভাশিস দাশ

রাকেশ বাজার নামিয়ে রুমিকে বলল, 'দিপুর মা এলে বোলো কাল ওকে আসতে হবে না।'

কথাটি শেষ না হতেই একরকম ঝাঁঝিয়ে উঠল রুমি – 'কেন? কাল কী? সকালের কাজগুলো তুমি করবে? রাতের বাসনগুলো?'

রাকেশ এ রকমটা হবে জেনেও বলেছিল কথাটা। কেন না কাল তো সকাল ন'টার মধ্যেই বেরিয়ে যেতে হবে।

পিকনিকের গাড়ি তো রেডি হয়ে আসবে। রাকেশ বলল, 'তোমার আর পরিবর্তন হল না। একে তো শীত তার ওপর কাল নববর্ষ। আমরা থাকব না। অত সকালে কাল না হয় ওকে ছুটিই দিলাম। আজ রাতেও তো আমাদের নেমন্তন্ন। বাসন কোথায় থাকবে?

রুমি বাজারের ব্যাগটা হাতে নিয়ে একটু তির্যক সুরেই বলল, 'ঠিক আছে ঠিক আছে, আসুক তো পরে হবে।'

বলতে বলতেই দিপুর মা ঢুকে গেল। সকালের টিফিন করতে রান্নাঘরে যেতেই রুমি বলল মাসি কাল দিপুকে নিয়ে সকালে এসো। শাড়িটা একটু ভালো পরে আসবে। ঠিক সাড়ে আটটার মধ্যে।

'কেন বউদি?'

দরকার আছে। এই বলে রুমি স্নানে চলে গেল।

রুমির কথাগুলো রুমি আর দিপুর মার মধ্যেই থাকল। রুমির মা সব কাজ সেরে চলে যাওয়ার সময় প্রতিদিনের মতো বলল বউদি আসি!

রুমি বলল তা হলে কাল সকাল সকাল আসবে।

রাকেশ পাশের ঘর থেকে সব শুনল।

দিপুর মা চলে যেতেই রাকেশ বলল, সত্যি রুমি তুমি আর মানুষ হলে না।

রুমি কোনও কথা বলল না।

পরদিন সকালে দিপুর মা এলে সব প্রকাশ পেয়ে গেল।

রুমি শুধু বলল আমি আগেই বিভাসকে ওদের জন্য পিকনিকের টাকা দিয়ে রেখেছিলাম।

রাকেশ কোনও কথা বলতে পারল না।

ভোঁকাট্টা

সূর্যদীপ্তা সরকার

ছেলেবেলায় বেশ ভালো ঘুড়ি ওড়াতেন আকাশবাবু। তখন থেকেই ঘুড়ির প্রতি তাঁর গভীর প্রাণের টান। তাই হয়তো ছেলের নাম রেখেছেন চাঁদিয়াল।

প্রায় একমাস হল, চাঁদিয়ালের অসুখ করেছে। কী অসুখ, তা সে জানে না। বাড়ি থেকে বেরোনো তার মানা। তাই অলস দুপুরে ছাদে বসে বসে সে দেখে আকাশ, গাছপালা, ফুল, পাখি – আরও কত কী! মন তার ছুটে যায় সুদূর কল্পনার রাজ্যে।

একদিন সে দেখল, আকাশ ছেয়ে গিয়েছে রং-বেরংয়ের ঘুড়িতে। দুই দলের চলছে লড়াই, এমন সময় মা এলেন তাকে ঘরে নিয়ে যাওয়ার জন্য। চাঁদিয়াল বলল, 'মা, ঘুড়ির লড়াই চলছে, এখনও যে ভোঁকাট্টা হয়নি।' কিন্তু ঘরে তাকে যেতেই হল শেষ পর্যন্ত।

কিছুদিন পর, চাঁদিয়ালের প্রবল জ্বর হয়েছে। ডাক্তারবাবু ওষুধ দিয়ে ফিরে গিয়েছেন। মা ওষুধ খাওয়াতে গেলেন চাঁদিয়ালকে। হঠাৎ চাঁদিয়ালের চোখে এক অনাবিল আনন্দের স্রোত বয়ে গেল। সে পাশ ফিরে শুয়ে বলল,

'হয়েছে –।'

বাবা বললেন, 'কী হয়েছে?'

অস্পষ্ট স্বরে উত্তর এল – 'ভোঁকাট্টা'।

আকাশে উড়তে থাকা লাল-হলুদ চাঁদিয়ালটাও ভোঁকাট্টা হয়ে উড়ে যাচ্ছে যাচ্ছে দূরে – আরও দূরে – বহুদূরে।

অঙ্কন ঃ শংকর বসাক